দেশের
মানুষ
দেশবন্ধু

দেশের মানুষ দেশবন্ধু

মিহির সেন

গ্রন্থনিলয়
৫৯/১বি, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

দেশের মানুষ দেশবন্ধু

দেশের মানুষ দেশবন্ধু

আজ থেকে অনেকদিন আগের কথা।

ভাল করে ভোরের আলো ফোটে নি তখনও। হঠাৎ সারা কলকাতা শহর যেন পাগলের মত ছুটে আসতে শুরু করল শিয়ালদহ স্টেশনের দিকে। আসছে তো আসছেই, মানুষের আর শেষ নেই। একটু বেলা বাড়ার সংগে সংগে শিয়ালদহ হয়ে উঠল মানুষের মহাসাগর।

সে-জনতায় জাতের ভেদ নেই। বয়সের ভেদ নেই। হিন্দুর পাশে মুসলমান, মুসলমানের পাশে খৃস্টান। বুড়ো বালক, নারী পুরুষে থই থই করছে পথঘাট। কারো মুখে কোন কথা নেই। শোকে যেন পাথর সবাই। চোখ দিয়ে জল পড়ছে কারো, কেউ বা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আর অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে কখন সেই ট্রেনটা আসবে। দেশের বন্ধু, গরীবের বন্ধু তাদের পরম প্রিয় নেতার মৃতদেহ নিয়ে কখন এসে পৌঁছাবে সেই বিশেষ ট্রেনটা।

জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখছিল পিকলু। কি হয়েছে জানে ও। কাকে আনছে জানে। কিন্তু

তাঁর সব কথা জানে না। কোন গুণে একজন মানুষ এমন করে সব মানুষকে কাঁদাতে পারে জানতে ইচ্ছে হল।

মার কাছে জানবে বলে মার কাছে এল। দেখল মা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বাবার কাছে গেল পিকলু। বাবা চোখ বুঁজে শুয়ে আছেন বিছানায়। গুটি গুটি পায়ে বারান্দায় দাদুর পাশে এসে দাঁড়াল এবার। দাদুর চোখ-মুখ থম থম করছে। চোখে জল। দাদুর হাতের উপর হাত রাখে পিকলু। দাদু ফিরে তাকান। বলেন, কিছু বলবে ?

পিকলু আস্তে বলল, আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে।

দাদু বললেন, কি ?

—দেশবন্ধুর কথা। বলবে আমাকে ?

দাদু একবার পিকলুর দিকে তাকালেন, তারপর সেই বিশাল জনতার দিকে। এখনও ট্রেনটা আসার কিছু দেরী আছে বোধ হয়।

দাদু পিকলুকে কাছে টেনে নিলেন। পাশে বসালেন। বললেন, বলব না কেন ? নিশ্চয়ই বলব। দেশকে জানতে হলে, জাতিকে জানতে হলে দেশবন্ধুর কথা জানতেই হবে। শুধু একজন বড় নেতা বলে নয়, একজন অসাধারণ মহান মানুষ বলেও।

একটু থামলেন দাদু, তারপর শুরু করলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের গল্প।

গ্রামের নাম তেলিরবাগ। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণায় পদ্মানদীর পাড়ে গ্রামটি। অনেক নাম-করা পরিবারের বাস ছিল এই গ্রামে। দাশ পরিবার তাদের ভেতর একটি। এক ডাকে চিনত সবাই। বিশেষ করে তাঁদের দানধ্যান আর অতিথি-সেবার জন্য। চিত্তরঞ্জন জন্মেছিলেন এই দাশ পরিবারে। তেলিরবাগ তাঁদের কয়েক পুরুষের বাসভূমি।

জন্ম যদিও কলকাতায় তবু দেশের নামে গর্ব বোধ করতেন চিত্তরঞ্জন। দেশ-বিদেশ জুড়ে যখন নাম-ডাক তাঁর, এই বিশাল দেশের বিরাট নেতা, তখনো বলতেন, যে দেশেই থাকি না কেন, যত বিদেশেই ঘুরে বেড়াই না কেন, যখনই মনে হয় আমি বিক্রমপুরবাসী তখনই বুকটা গর্বে ভরে ওঠে। বিক্রমপুর যে আমার শিরায় শিরায়—আমার রক্ত-মাংসের সঙ্গে মিশে আছে।

আর গর্ব ছিল তাঁর নিজের বংশের জন্য। সত্যিই গর্ব করার মতই বংশ ছিল এই দাশ-বংশ। বিদ্যায়, রুচিতে, দানধ্যানে এক ডাকে চিনবার মত।

বিশেষ করে এ পরিবারের অকাতর দান ও অতিথি-সেবার

কাহিনী ঘুরত লোকের মুখে মুখে। চিত্তরঞ্জনের যে ত্যাগ ও দানের কথা শুনে আমরা অবাক হই—শুধু আমরা কেন, ইংরেজ বিচারপতিকেও অবাক হয়ে বলতে হয়, এমন নজির বিলাতেও দেখা যায় না—সেই দানের মন পেয়েছিলেন তিনি পূর্বপুরুষের কাছ থেকেই।

পূর্বপুরুষের কয়েকটা গল্প থেকেই তা বুঝতে পারবে। চিত্তরঞ্জনের প্রপিতামহের নাম ছিল চন্দ্রনাথ দাশ। তিনি খুব অতিথিপরায়ণ ছিলেন। তাঁর অতিথিশালায় অতিথিসেবা ঠিকমত চলছে কিনা দেখবার জন্য একদিন রাত্রে তিনি দূর থেকে অতিথি সেজে এসে হাজির হলেন অতিথিশালায়। সেখানকার লোকজন ঠিক চিনতে পারে নি তাঁকে। খাবার সময় তাকে মাছ দেওয়া হল না। তাই দেখে ভীষণ চটে গেলেন তিনি। তাঁর পরিচয় পেয়ে পরে যখন তাঁকে কই মাছ এনে দেওয়া হল তিনি রাগে তা ছুঁলেনও না।

শুধু তিনি কেন, তাঁর স্ত্রীও ছিলেন সেই রকমই। একদিন অসময়ে বাড়ীতে কজন অতিথি এসে হাজির। বাড়ীতে তখন হাতের কাছে ঝি-চাকর কেউ নেই। কি করেন! অথচ অতিথি বাড়ী থেকে ফিরে যাবে তাও হতে পারে না। একটু ভাবলেন তিনি। তারপর নিজেই একটা ময়লা শাড়ী পরে ঝি সেজে অতিথি-সেবায় লেগে গেলেন।

চিত্তরঞ্জনের পিতামহ কাশীশ্বর দাশ যা আয় করতেন তার প্রায় সবই খরচ করতেন গরীব আর আত্মীয়স্বজনদের ভরণ-পোষণের জন্য। অথবা অতিথি-সেবায়। তিনিও একবার অতিথি সেজে দুপুর রাতে নৌকো করে ঘাটে এলেন। এসে খবর পাঠালেন, ঘাটে একজন অতিথি এসেছেন; না খেয়ে আছেন তিনি। কিন্তু খবর পেয়েও অত রাতে কেউ আর অতিথি-সেবার জন্য এল না। পরদিন বাড়ি ফিরে কর্মচারীদের দারুণ বকলেন তিনি। বললেন, এরপর এরকম ঘটনা ঘটলে তোমাদের শাস্তি পেতে হবে।

চিত্তরঞ্জনের বাবা ছিলেন ভুবনমোহন দাশ। চিত্তরঞ্জনকে জানতে হলে তাঁর বাবাকে ভাল করে জানতে হয়। দেশবন্ধু তাঁর অনেক গুণ পেয়েছিলেন বাবার কাছ থেকেই।

ভুবনমোহন গুণী লোক ছিলেন। অনেক বিষয়ে দখল ছিল তাঁর। অল্প বয়সেই গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় এসেছিলেন তিনি। কলকাতায় এসে আইন পাশ করে হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। অনেক টাকা আয় করতেন তিনি, কিন্তু জমাতে পারতেন না এক পয়সাও। নিজে তিনি বিলাসী ছিলেন না, নিজেদের আমোদ বা সুখের জন্যও আজেবাজে খরচ ছিল না

তাঁর। কিন্তু দানের ব্যাপারে ছিলেন ভীষণ বেহিসেবী। গরীবের দুঃখ দেখলে তিনি ঠিক থাকতে পারতেন না। কেউ টাকার জন্য অসুবিধায় পড়েছে শুনলেই তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন। হাতে টাকা না থাকলে ধার করেও দান করতেন। কিন্তু তাঁর সব দান ছিল নীরব। ঢাকঢোল পিটিয়ে সবার কাছে তা ঘোষণা করতে ভালবাসতেন না তিনি।

তাঁর বাড়ীতে যে কত আত্মীয়স্বজন থাকত, কত গরীব ছাত্র যে তাঁর টাকায় পড়ত, খেত তার হিসেব নেই। তাদের বিদ্যালয়ের বেতন, খোরাক, জামা কাপড় তো দিতেনই, এমন কি বাড়ী যাতায়াতের খরচ পর্যন্ত হাসিমুখে বহন করতেন। আসলে আপন-পর বলে কিছু ছিল না, লোকজন নিয়ে থাকতেই তিনি ভালবাসতেন। কালীনারায়ণ ঠাকুর বাড়ীর হিসেব-পত্র রাখতেন। তিনি একবার বলেছিলেন, আমি বাড়ী গেলে ক'দিন পরই কত্তাবাবু খামে ভরে টাকা পাঠাতেন, আর লিখতেন, এবার চলে এস, একা থাকতে ভাল লাগছে না।

পরে ভুবনমোহনের অবস্থা যখন খুব পড়ে যায় তখনও তিনি কাউকে বাড়ী থেকে বিদায় করে দেন নি। একদিন কথায় কথায় চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন যে, এঁদের কেউ কেউ যদি এখন নিজেদের বাড়ি চলে যান আর আমরা নিয়মিত শুধু টাকা দিয়ে এঁদের সাহায্য করি তাহলে কেমন হয়।

ভুবনমোহন শুনে খুব দুঃখিত হলেন। মত দিলেন না।

শুধু যে দানশীল ছিলেন তাই নয়, তিনি সে যুগের সমাজের একজন নেতাও ছিলেন। তখনকার দিনে অনেক ইংরেজি শিক্ষিত লোক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করতেন। ভুবনমোহনও তাই করেছিলেন। কিন্তু মনের দিক থেকে কোনদিনই তিনি হিন্দু সমাজ থেকে দূরে সরে যান নি।

সেই সময় ব্রাহ্মসমাজ থেকে তাদের ধর্মমত ছড়িয়ে দেবার জন্য 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' নামে কাগজ বের করা হয়। ভুবনমোহনের ওপর কাগজটি সম্পাদনার ভার পড়ে।

ভুবনমোহন দেশের কথা ভাবতেন। দেশের পরাধীনতার জন্য জ্বালা বোধ করতেন। ধর্মের জন্য কাগজ বের করা হলেও ধীরে ধীরে তাই কাগজের অনেক লেখায় রাজনীতির কথাও ফুটে উঠতে লাগল। মাঝে মাঝে রাজনীতির উপর এমন সব রচনা ছাপা হতে শুরু হল যে ইংরেজ সরকার কাগজের উপর চটে গেল। এতে ব্রাহ্মসমাজের নেতারা অনেকে ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁরা ভুবনমোহনকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দিলেন।

কিন্তু বিদেশী শাসকের ভয়ে ভীত হবার লোক ছিলেন না ভুবনমোহন। এবার সরাসরি রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করার জন্যই নতুন একটা কাগজ বের করলেন তিনি।

সেই কাগজ ও তার লেখা থেকেই শেখা যায় যে তিনি কত

সাহসী ছিলেন। আর দেশকে কত গভীরভাবে ভালবাসতেন তিনি। বালক চিত্তরঞ্জনের মনে বাবার এই রূপ গভীর ছাপ ফেলেছিল।

ভুবনমোহন একজন সুকবিও ছিলেন। তাঁর রচিত অনেক গান তখন লোকের মুখে মুখে ঘুরত। সে-সব গানে তিনি নিজেই সুর দিতেন। নিজে বেশ ভাল গাইতেও পারতেন।

চিত্তরঞ্জনের মাও ছিলেন একজন আদর্শ মহিলা। আদর্শ জননী। দানে তাঁরও ছিল সমান উৎসাহ। দেবদেবীতে ছিল অটল ভক্তি। গরীব দুঃখীর সেবায় ছিলেন অনলস। এমন কি বাড়ীর দাসীর ছেলেমেয়ের সংগেও তিনি নিজের ছেলে-মেয়ের মতই ব্যবহার করতেন। আপন-পর কোন ভেদ ছিল না তাঁর কাছে।

এসব গুণের জন্য পাড়াপড়শি সকলেই খুব ভালবাসত তাঁদের। সমাজের সকলেই মেনে চলত।

কিন্তু সব মানুষ তো সমান নয়। ভুবনমোহনের এই উদারতার সুযোগ নিয়েই একদিন একটি মানুষ তাঁর এমন একটি ক্ষতি করে গেল, যে ক্ষতি তিনি জীবনে পূরণ করতে পারলেন না। সে ক্ষতি তাঁর সমস্ত জীবনকে দুঃখে ভরে দিয়েছিল।

একদিন ভুবনমোহন একা বসে আছেন, একজন পরিচিত লোক এসে কেঁদে ফেলে বলল, ভীষণ বিপদে পড়ে আপনার

কাছে এসেছি। আপনি আমার জন্য যদি চল্লিশ হাজার টাকার জামিন না হন তাহলে মরে যাব আমি। আপনি আমাকে বাঁচান।

লোকটির কাতর আবেদনে ভুবনমোহন খুব বিচলিত হলেন। তিনি কোন বিচার না করেই অতগুলো টাকার জামীনপত্রে সই করে দিলেন। লোকটি আবেগে হাত চেপে ধরল তাঁর।

কিন্তু সেই যে গেল লোকটি আর এল না। কোনদিনই না। ফলে অতগুলো টাকার দেনা এসে চাপল ভুবনমোহনের উপর। শেষ পর্যন্ত সেই দেনা শোধ করার কোন উপায় নেই দেখে তাঁর আদালতের আশ্রয় নিয়ে দেউলিয়া হতে হল।

আইনের নিয়মে কেউ একবার দেউলিয়া হলে পাওনাদারেরা আর কিছু করতে পারে না। টাকা জোর করে আদায় করতে পারে না। কিন্তু তাদের হাত থেকে বাঁচলেও যিনি দেউলিয়া হন তিনি মরমে মরে থাকেন। সমাজের কাছে তাঁর মান হারাতে হয়। সবার চোখে হেয় হতে হয়।

ভুবনমোহনেরও তাই হয়েছিল। এই ঘটনায় তিনি মনে দারুণ আঘাত পেলেন। মন ভেঙ্গে গেল তাঁর। আস্তে আস্তে শরীরও। কিন্তু অন্যের উপকার করতে গিয়ে এই আঘাত মুখ বুঁজে মেনে নিলেন তিনি।

চিত্তরঞ্জনের জন্ম ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর। কলকাতায়।

ভুবনমোহন তখন একজন নাম-করা বড়লোক। টাকা পয়সার অভাব নেই। লোকজনে গমগম করছে বাড়ী। বাড়ীতে খুশির ঢেউ বয়ে গেল তাই চিত্তরঞ্জনের আগমনে। ভালবাসা আদরযত্নে রাজার ছেলের মতই বড় হতে লাগলেন তিনি।

ছেলেবেলায় দেখতে ভারী সুন্দর ছিলেন চিত্তরঞ্জন। টুলটুলে মুখ। মিষ্টি চেহারা। দুই চোখে গভীর বুদ্ধির ছাপ। তাঁর দিকে তাকালে চোখ ফেরান যেত না। কি যেন একটা ছিল চেহারায়, দেখলেই মনে হত বড় হয়ে বড় কিছু হবেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বোন স্বর্ণকুমারী দেবী একদিন তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে চিত্তরঞ্জনের মাকে হেসে বলেছিলেন, আপনার ছেলেটিকে দেখছি। দেখবেন এ ছেলে বড় হয়ে নামকরা লোক হবেই।

এত বড়লোকির ভেতর মানুষ হলে কি হবে, ছেলেবেলা থেকেই চিত্তরঞ্জনের এজন্য কোন গর্ব ছিল না। গরীব ছেলেদের সংগেও মন খুলে মিশতেন। খেলতেন। কারো দুঃখ দেখলে চোখ ফেটে জল আসত। পথে কোন ভিখারী হাত পেতে পয়সা চাইলে পকেটে যা থাকত দিয়ে দিতেন।

চিত্তরঞ্জনের পড়াশুনার দিকে বাবা ভুবনমোহনের সজাগ নজর ছিল। বাড়ীর পড়াশুনা শেষ হলে ছেলেকে তিনি ভবানীপুরের একটি মিশনারী স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। স্কুলে

ভর্তি হয়ে খুব খুশি চিত্তরঞ্জন। নতুন পরিবেশ, নতুন নতুন খেলার সাথী—পড়াশুনা খেলাধুলার ভেতর দিয়ে বেশ কেটে যেতে লাগল দিনগুলো।

ছেলেবেলা থেকেই খুব মিশুক ছিলেন তিনি। কেউ আলাপ করতে না চাইলেও নিজে গিয়েই আলাপ করে নিতেন। গরীব বড়লোক সব ছেলের সাথেই মেলামেশা ছিল সমান।

নিজের জলখাবারের পয়সায় যে খাবার কিনতেন সবাই মিলে ভাগ করে খেতেন। কারো কোন অভাব অভিযোগের কথা জানতে পারলে যেটুকু পারতেন সাহায্য করার চেষ্টা করতেন। দেখতে দেখতে সবার প্রিয়ই হলেন না, তাদের নেতাও হয়ে উঠলেন।

নেতা হবার গুণ ছিল তাঁর সে বয়স থেকেই। অন্য ছেলেদের ভেতর ঝগড়া মারামারি হলে সবাই এসে তাঁর কাছে হাজির হত। তিনি দু'দলের কথাই মন দিয়ে শুনতেন। তারপর খুব ভাল করে ভেবে চিন্তে নিজের রায় দিতেন। বন্ধুরাও তাঁর কথা মেনে নিত। সবাইকে সমান দরদ দিয়ে ভালবাসতেন বলেই তাঁর কথাও এভাবে মেনে নিত সবাই। এই ভালবাসা দিয়েই চিত্তরঞ্জন অনেক খারাপ ছেলেকেও ভাল করে তুলেছিলেন।

কিন্তু একটা ব্যাপারে ছেলেবেলা থেকেই কঠোর ছিলেন

চিত্তরঞ্জন। কোন অন্যায় তিনি মুখ বুঁজে মেনে নিতেন না, সংগে সংগে প্রতিবাদ করতেন।

একটি করে বছর যায়, নতুন ক্লাশে ওঠেন চিত্তরঞ্জন, আর আরো বেশী ছেলে তাঁর পাশে জড়ো হতে থাকে। এমনি করে একসময় তিনি প্রায় গোটা বিদ্যালয়েরই নেতা হয়ে উঠলেন।

ক্লাশের ছকবাঁধা পড়াশুনায় কিন্তু কোনদিনই সেরকম মনোযোগী ছিলেন না তিনি। বাইরের বইয়ের উপর ঝোঁক ছিল অনেক বেশী। নিজের পয়সা দিয়ে ঐ বয়সেই ইংরাজী বাংলা নানা ধরনের বই কিনতেন। আর এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলতেন যেন।

আর সখ ছিল কবিতা লেখার। খেলাধুলাতেও ঝোঁক ছিল। পরীক্ষায় কিন্তু খারাপ ফল করতেন না। পাশের পড়া পড়তেন পরীক্ষার দু'তিন মাস আগে থেকে। রাত জেগে। আর এভাবেই ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পাশ করলেন তিনি।

ভর্তি হলেন গিয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে। মধুর স্বভাবের জন্য সেখানেও ছেলেদের বশ করে ফেললেন। কলেজের সব উৎসবেই, ছাত্রদের সব ব্যাপারেই সমান উৎসাহ নিয়ে যোগ দিতেন। অল্পদিনের ভেতরই কলেজেও পরিচিত হয়ে উঠলেন তাই। আর এই সময়েই তাঁর আর একটা গুণের কথাও সবাই জানতে পারল। সেটি তাঁর বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা। কলেজের

বিতর্ক সমিতির তিনি একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। সেখানে বিতর্কের সময়ই এটা জানা গেল।

কলেজে পড়বার সময় চিত্তরঞ্জনের জীবনের আর একটি বড় ঘটনা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগে পরিচয়। সুরেন্দ্রনাথ তখন একজন নাম করা নেতা। কিছুদিন আগেই আই. সি. এস-এর চাকরি থেকে ইংরেজ সরকার তাঁকে অন্যায়ভাবে বিতাড়িত করেছে। সারা দেশ আন্দোলনে মাতিয়ে তুলেছেন সুরেন্দ্রনাথ।
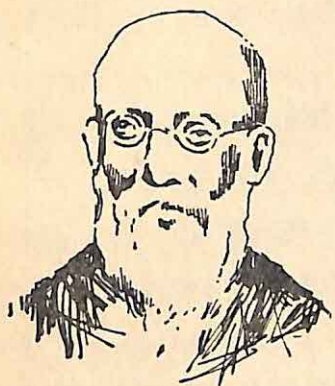
সেসময় ছাত্রদের একটা সমিতি ছিল। নাম 'স্টুডেণ্টস এসোসিয়েশন'। কলেজে ঢুকেই সেই সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন। এবং ধীরে ধীরে তার নেতা হয়ে উঠেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন ঐ সমিতির সভাপতি। এই বিরাট নেতার কাছ থেকেই চিত্তরঞ্জন রাজনীতির প্রেরণা ও পাঠ পেয়েছিলেন।

চিত্তরঞ্জন বি. এ. পাশ করলেন ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে। কলেজ তো শেষ হল। এবার? তখনকার দিনে যাদের ছেলেকে বিলেত পাঠানোর মত টাকাকড়ি ছিল তারা সকলেই চাইতেন ছেলেকে বিলেত থেকে আই. সি. এস. পাশ করিয়ে আনেন।

কারণ একবার ওখান থেকে পাশ করে ফিরতে পারলেই সরকারী হাকিমি চাকরি বাঁধা। সে চাকরির যেমন বেতন, তেমন নাম আর সেই রকম দাপট।

ভুবনমোহনেরও অনেক দিন থেকেই এই সাধ ছিল। তিনি চিত্তরঞ্জনকে আই. সি. এস. পরীক্ষা দেবার জন্য বিলেত পাঠালেন।

অবশ্য শুধু সাধ থাকলেই হয় না, টাকা থাকলেও নয়—এই পরীক্ষাটা ছিল ভীষণ কঠিন। শুধু বই পড়ে পাশ করা নয়, আরো অনেক কিছু পরীক্ষা করা হত ছাত্রদের। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের নিজের উপর বিশ্বাস ছিল যে তিনি ঠিক পাশ করতে পারবেন।

কিন্তু জাতির মান তাঁর কাছে আরো অনেক বড় ছিল বলেই শেষ পর্যন্ত তাঁর হাকিম হয়ে দেশে ফেরা হল না।

চিত্তরঞ্জন বিলেত গিয়ে বেশ মন দিয়েই পড়াশুনা শুরু করেছিলেন। এখানে অনেক কিছু দেখবার জানবার সুযোগ পেলেন তিনি। জীবনটাকে নতুন করে চিনবার সুযোগ পেলেন।

কিন্তু খুব বেশীদিন নিজের মনে চুপচাপ থাকা হয়ে উঠল না তাঁর। আচমকা একদিনের একটা ঘটনায় তাঁকে সবার সামনে এসে দাঁড়াতে হল।

বিলাতের পার্লামেণ্টে জেমস্ ম্যাকলিন নামে একজন সদস্য

ছিলেন। তিনি একদিন একটা ভাষণে ভারতীয়দের সম্বন্ধে হীন ভাষায় বললেন, ভারতবাসীরা তো অসভ্য। হিন্দু-মুসলমানরা গোলামের জাত ছাড়া কিছু নয়। তাদের আবার আদর্শ কি?

দেশকে নিজের চেয়েও ভালবাসতেন চিত্তরঞ্জন। দেশের এই অপমানে দারুণ আঘাত পেলেন তিনি। ঠিক করলেন, এর প্রতিবাদ করতে হবে। মুখ বুঁজে এ অপমান কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।

একদিন ওখানকার ভারতীয়দের একটা সভা ডাকলেন তিনি। এবং সেই সভায় ম্যাকলিনের কথার কঠোর প্রতিবাদ জানালেন। সভার সকলে তাঁর ভাষণ শুনে অবাক হয়ে গেল। কী তেজ! কী আগুন ছড়ানো ভাষা।

পরদিন সব কাগজে তাঁর ভাষণ ছাপা হল। একদিনেই সবার কাছে পরিচিত হয়ে উঠলেন চিত্তরঞ্জন।

ওই দেশে 'উদারনৈতিক দল' নামে একটা রাজনৈতিক দল আছে। এবার তাঁদের নজর পড়ল এই ভারতীয় যুবকটির উপর। তাঁরা পরদিন আর একটা প্রতিবাদ সভায় কিছু বলবার জন্য চিত্তরঞ্জনকে সাদরে ডেকে পাঠালেন। সেই সভাতেও কঠোর ভাষায় চিত্তরঞ্জন ম্যাকলিনের কথার প্রতিবাদ করলেন। এবং ভারতের পুরানো সভ্যতা ও শিক্ষার ইতিহাস সবার চোখের সামনে তুলে ধরলেন।

শেষ পর্যন্ত এই প্রতিবাদের ফল হল। একুশ বছরের সেই ভারতীয় যুবকের কাছে পরাজয় মেনে নিতে হল রাজার জাত ম্যাকলিনের। তাঁর হীন কথার জন্য খোলা সভায় দাঁড়িয়ে ক্ষমা চাইলেন তিনি। এবং বাধ্য হয়ে এরপর পার্লামেণ্টের সদস্য পদও তাঁর ত্যাগ করতে হল।

ঠিক এই সময় আর একটি ঘটনা ঘটে। সামনেই ছিল পার্লামেণ্টের নির্বাচন। ভারতের দাদাভাই নওরোজী পার্লামেণ্টের সদস্য পদের জন্য নির্বাচনে দাঁড়ান। ভারতীয় ছাত্ররা তাদের এই প্রিয় নেতাকে জয়ী করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়। দাদাভাই দেশকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। চিত্তরঞ্জনও তাই দাদাভাইয়ের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তার পর শুরু হল কাজ। সভার পর সভা। চিত্তরঞ্জনের আগুনের মত ভাষণ। বিলাতের লোক তাঁর বক্তৃতায় অবাক হল। বড় বড় কাগজে তাঁর প্রশংসা ছাপা হতে লাগল। চারদিকে যেন জয়জয়কার চিত্তরঞ্জনের।

কিন্তু এতে ভয় পেল ইংরেজ সরকার। যে ছেলের এমন সাহস, দেশকে এমন গভীরভাবে ভালবাসে যে, তাকে কি সরকারী চাকরি দেওয়া নিরাপদ? তাও আবার হাকিমের মত অত বড় একটা পদ?

নিজেদের ভেতর গোপন আলোচনা হল। তারপর

ঠিক হল, না সেটা নিরাপদ নয়। তাই শেষ পর্যন্ত আই, সি, এস-এর তালিকা থেকে চিরদিনের জন্য বাদ পড়ে গেল একটি নাম—চিত্তরঞ্জন দাশ।

কিন্তু ইংরেজ সরকার সেদিন বুঝল না যে, না জেনেই তারা ভারতবর্ষের কতবড় একটা উপকার করল। ভারত সেদিন একজন হাকিম হারাল হয়তো যাতে দেশের কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু কদিন পর তারা একজন বিরাট নেতা লাভ করল, যা না পেলে দেশের দারুণ ক্ষতি হত।

চিত্তরঞ্জন দমলেন না। নতুন উদ্যমে তিনি ব্যারিস্টারি পড়তে শুরু করলেন। এবং সে পরীক্ষায় পাশ করে দেশে ফিরে এলেন।

দেশে এসে ব্যারিস্টারি শুরু করলেন চিত্তরঞ্জন।

তেলিরবাগের দাশ-পরিবার কয়েক পুরুষ ধরেই আইন-ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিল। বাবা, কাকা, ঠাকুরদাদের কেউ মোক্তার, কেউ উকিল, কেউ ব্যারিস্টার। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের ছেলেবেলা থেকেই আইন-আদালত ভাল লাগত না। খুব ছেলেবেলাতেই একদিন বলেছিলেন তিনি, জুয়াচুরি না করে কেউ উকিলি ব্যবসায় নাম করতে পারে না। বড়রা হেসে বলেছিলেন, পাকা ছেলে!

কিন্তু দেশে ফিরে সেই আইন-ব্যবসাই শুরু করতে হল তাঁর। অন্য কিছু ভাববার উপায়ও ছিল না তখন। বাবা ভুবনমোহন তখন অবসর নিয়েছেন। দেউলিয়া হবার অপমানে শরীর-মন দুইই ভেঙ্গে গেছে। অভাব-অনটনের ভেতর দিয়ে চলছে পরিবার। নিজেদের ও বাইরের লোকজন নিয়ে অতবড় পরিবারের সব ভার এসে পড়েছে চিত্তরঞ্জনের উপর।

ব্যারিস্টারি শুরু করলেন, কিন্তু মক্কেল কোথায়? একে নতুন, বয়স কম, তারপর বাবার দেউলিয়া বদনাম—তাঁর কাছে কেউ কেস্ নিয়ে আসতে চায় না।

চিত্তরঞ্জনের জীবনে এক নতুন লড়াই শুরু হল। অভাবের সঙ্গে লড়াই। মাঝে মাঝে এমন অভাব পড়ত যে বাজার করার জন্য একটা টাকাও ধার করতে হত। পয়সা বাঁচানোর জন্য আদালত থেকে পায়ে হেটে বাড়ি ফিরতেন।

তার উপর আর এক ভাবনা বাবার জন্য। বাবা মুখ ফুটে না বললেও তিনি বুঝতেন দেউলিয়া হবার দুঃখে বাবা মনে মনে রাতদিন পুড়ছেন যেন। অথচ টাকার অভাবে বাবাকে সেই অপমানের বেড়াজাল থেকে বাইরে আনতে পারছেন না তিনি। সেটুকু ক্ষমতাও নেই তাঁর। মনে মনে অনুতাপে পুড়ে মরেন চিত্তরঞ্জন। শেষ পর্যন্ত আর কিছু না করতে পেরে তিনি যা করলেন তাতে সকলে অবাক হয়ে গেল। পাওনাদারদের ডেকে

বাবার দেনার সব ভার নিজের উপর তুলে নিয়ে তিনি নিজেও দেউলিয়া হলেন।

এতে না হয় বাবাকে কিছুটা শান্তি দিলেন, কিন্তু পরিবার চলবে কি করে ?

অবশেষে ভেবে দেখলেন কলকাতার আদালতে উকিল ব্যারিস্টারের যে রকম ভীড়, তাতে তাঁর মত নতুন কারো পসার জমানো ভীষণ কঠিন। তাই তিনি কলকাতার বাইরের আদালতে গিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন।

তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ধর্মের পথে থেকে মন দিয়ে খেটে কাজ করতে পারলে একদিন না একদিন জয় হবেই। নতুন করে আবার খাটতে শুরু করলেন তাই। রাত জেগে নতুন নতুন আইনের বই পড়তে শুরু করলেন।

একটা দুটো করে মক্কেল আসতে শুরু করল। কিছুটা নাম হল তাঁর। আরো কিছু মামলা এল এবার। আরো কিছু লোক নাম জানল। এমনি করে ধীরে ধীরে পসার জমে এল, বাড়তে লাগল আয় আর যশ।

এই সময় তাঁর হাতে এমন একটা মামলা এল যাতে চিত্তরঞ্জন রাতারাতি সারা দেশে পরিচিত হয়ে গেলেন। দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর নাম। মুখে মুখে তাঁর জয় জয়কার।

ইতিহাসে সেই মামলার নাম—মুরারি পুকুরের বোমার

মামলা। আদালতের ইতিহাসেও এরকম গরম মামলার নজির খুব বেশি নেই। এ মামলার একজন বড় আসামী ছিলেন ঋষি অরবিন্দ
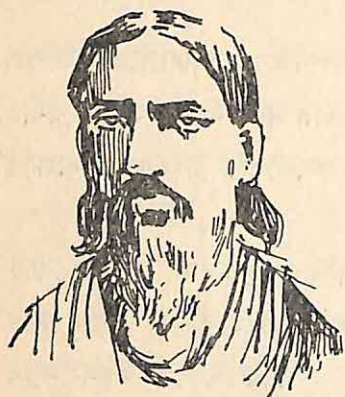
মামলাটা রাজনীতির সংগে জড়িত বলেই আমাদের দেশের তখনকার রাজনৈতিক ইতিহাস কিছুটা জানা দরকার।

গোটা দেশ জুড়ে তখন স্বদেশী আন্দোলন চলছে। বিদেশী সরকারের শাসন আর মানতে চাইছে না মানুষ। পরাধীনতার শিকল ছিড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

কংগ্রেসের পতাকার তলে দলে দলে মানুষ এসে জমা হচ্ছে। জাতীয় নেতাদের আদেশ মত পথে পথে আন্দোলন করছে।

কিন্তু আর এক দল তখন গোপনে তৈরী হচ্ছিল বিদেশী সরকারকে গুলি-বোমা-বারুদ দিয়ে এদেশ থেকে তাড়াবার জন্য। দেশের তরুণরাই ছিল এদলে সংখ্যায় বেশী। এদের নেতা ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ।

কিন্তু খুব বেশী দিন এ দল গোপন থাকল না। ছোটখাট কিছু ঘটনা এদিক ওদিক ঘটছিল, আচমকা একদিন বড় রকমের

একটি ঘটনা ঘটে গেল মজঃফরপুরে। গোটা দেশ এ ঘটনায় চমকে উঠল।

মজঃফরপুরের একজন ইংরেজ উকিলের মেয়ে আর বউ একদিন সকালে গাড়ী করে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। হঠাৎ তাদের গাড়ীর উপর একটা বোমা এসে পড়ল। দুজনই মারা গেল তাতে। চারদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল। পুলিশ অপরাধীকে ধরবার জন্য চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

ধরা পড়লেন ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী। প্রফুল্ল চাকী নিজের রিভলভারের গুলিতে নিজের প্রাণ দিলেন। পুলিশ জানতে পারল, এঁদের আসলে মারার ইচ্ছে ছিল জজ কিংসফোর্ডকে। মহিলা দু'জন ভুলের শিকার হয়েছেন।

ইংরেজ শাসকরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। তাদের ভেতর সাজ সাজ রব পড়ে গেল। যেমন করে হোক গোটা দলটাকে ধরতে হবে। এদের মূলসহ উপড়ে ফেলতে হবে।

পুলিশ খোঁজ করতে করতে মুরারী পুকুর রোডের একটা ঠিকানা পেল। আচমকা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা এই ঠিকানায়। এবং অবাক হয়ে দেখল এটা একটা গোপন বোমার কারখানা। অস্ত্রশস্ত্রসহ ধরা পড়লেন বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত এবং আরো অনেকে। এবং ঐ একই দিনে অন্য এক জায়গা থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল অরবিন্দ ঘোষকে।

এরপর ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলল ঘটনা। আসামীদের ভেতর নরেন গোঁসাই নামে একজন ভয়ে বেইমানী করল। রাজী হল আদালতে সরকারের পক্ষে স্বাক্ষী দেবে।

কিন্তু এই বেইমানী করার সুযোগ পেল না নরেন গোঁসাই। জেলের ভেতরই তার দলের দুজন, কানাই দত্ত ও সত্যেন বসু গুলি করে হত্যা করল তাকে। গোটা দেশ আর একবার চমকে উঠল। বিচারে দুজনেরই ফাঁসি হল। আর তার আগেই মজঃফরপুরের খুনের জন্য ফাঁসি হয়ে গেছে ক্ষুদিরামের।

গোটা দেশ উত্তেজনায় থমথম করছে। বিদেশী সরকারের দাপটে কাঁপছে সারা দেশ।

এরই ভেতর শুরু হল মুরারীপুকুরের বোমার মামলা। চারদিকে সাড়া পড়ে গেল। দেশের এই বীর সন্তানদের কি বাঁচান যাবে ?

বড় বড় ব্যারিস্টারদের কাছে ছুটল দলের ছেলেরা। কিন্তু তাঁরা যে টাকা চাইলেন তাতে পিছিয়ে আসতে হল তাদের। এবার ? অরবিন্দের সহোদরা সরোজিনী দেবী এবার ছুটে এলেন চিত্তরঞ্জনের কাছে। তখন সবে তাঁর পসার জমে উঠতে শুরু করেছে। কিন্তু অর্থের অভাব চলছে তখনও। তবু সরোজিনী দেবীর ডাকে তিনি সাড়া না দিয়ে পারলেন না।

অরবিন্দের পক্ষে আদালতে এসে দাঁড়ালেন তরুণ ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন। অর্থ নয়, যশ নয়—এলেন দেশের ডাকে।

শুরু হল সেই বিরাট মামলা। মাসের পর মাস চলল জেরা, জবানবন্দী, তর্কবিতর্ক। সব কিছু ভুলে মামলার অতলে ডুবে গেলেন চিত্তরঞ্জন। শুরু হল অমানুষিক পরিশ্রম। সারাদিন কাটত আদালতে। আর মাঝে মাঝে সারা রাত কেটে যেত মামলার কাগজপত্র দেখতে। মামলা তো নয়, যেন এক তপস্যায় বসেছেন। একমাত্র সাধনা, যেমন করে হোক দেশের এই বীর সন্তানদের বাঁচাতেই হবে।

এত বড় মামলা, কিন্তু নামমাত্র ফি। তাও অনিয়মিত হয়ে উঠল। তবু অন্য কোন মামলা হাতে নিলেন না। পাছে আসল মামলায় মনোযোগ কমে যায়।

ফলে আবার শুরু হল টাকার টানাটানি। হাতের সব টাকা একে একে শেষ হয়ে গেল। এবার বেচতে শুরু করলেন গাড়ী ঘোড়া। তারপর শুরু হল ধার। বাড়তে লাগল ধারের টাকা। বেড়ে বেড়ে একদিন এসে দাঁড়াল পঞ্চাশ হাজারে। তবু তিনি অবিচল। যেমন করে হোক, দেশের এই বীর সন্তানদের বাঁচাতেই হবে।

অরবিন্দ নিঃশব্দে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন এই তরুণ

তাপসকে। শুধু একদিন মুখ ফুটে বলেছিলেন, স্বয়ং নারায়ণ এসেছেন আমাকে বাঁচাতে।

আট মাস ধরে চলল সেই মামলা। গোটা দেশ অধীর হয়ে তাকিয়ে আছে শেষ ফলাফলের দিকে। কি হয় কে জানে!

অবশেষে মামলার শেষ দিন এল। মানুষের ভীড়ে ভরে গেল আদালত। তিল ফেলবার জায়গা নেই। আস্তে উঠে দাঁড়ালেন চিত্তরঞ্জন। আসামীর পক্ষে শুরু করলেন তাঁর সওয়াল।

সে সওয়াল শুনে অভিভূত হয়ে গেল গোটা আদালত। সে ভাষণ আইনের দিক দিয়ে অটুট, ভাবে-ভাষায় যেন কবিতা। শুনতে শুনতে আবেগে চোখের জল ধরে রাখতে পারল না কেউ। এমন কি বিচারকের পর্যন্ত চোখ ছলছল করতে লাগল।

যথাসময়ে মামলার রায় বেরুল। অরবিন্দ ঘোষ বেকসুর খালাস।

জয়জয়কার পড়ে গেল চিত্তরঞ্জনের। ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ল নাম। দেখতে দেখতে জমে উঠল পসার। দেশ-বিদেশ থেকে ডাক আসতে শুরু করল। একদিন যাঁর মক্কেলের খোঁজে ঘুরে বেড়াতে হত, আজ মক্কেলরাই তাঁর পিছে ছুটে বেড়াতে লাগল।

কিন্তু অনেককেই হতাশ করতে হত তাঁর। কারণ টাকার

লোভে একসাথে বেশী মামলা হাতে নিতেন না তিনি। বেশী মামলা নিলে কোনটাই মন দিয়ে করা যায় না বলে। তাতে কাজে ফাঁকি দেবার ঝোঁক আসতে পারে।

কিন্তু এরই ভেতর কোন রাজনৈতিক মামলা এলে তিনি ফেরাতেন না। টাকার অভাবে তারা ফি দিতে না পারলে বিনে পয়সাতেও মামলা করে দিতে গররাজী হতেন না। দেশকে গভীরভাবে ভালবাসতেন বলেই একে দেশের কাজ বলে ভাবতেন তিনি।

অভাবের দিন পেরিয়ে এলেন চিত্তরঞ্জন। সুদিনের মুখ দেখলেন আবার। দু'হাত ভরে টাকা আনতে লাগলেন আদালত থেকে। দিনে প্রায় বাঁধা দেড় দু' হাজার। কোন কোন দিন আয়ের অঙ্ক পাঁচ ছয় হাজারেও দাঁড়াত। শোনা যায় এদেশে তাঁর আগে কোন ব্যারিস্টার এ-আয়ের কথা ভাবতেও পারত না।

হাতে টাকা পেয়েই চিত্তরঞ্জন এবার অনেক দিনের একটা গোপন সাধ পূরণ করলেন। বাবার সেই দেনার অপমান রাতদিন গোপনে তাঁকে পুড়িয়ে মারছিল যেন। কিন্তু এতদিন টাকার অভাবে কিছু করার উপায় ছিল না। কিন্তু এবার তিনি যারা টাকা পেত তাদের সবাইকে ডেকে পাঠালেন। তারপর পাই পয়সা হিসেব করে সবার দেনা মিটিয়ে দিলেন। তারা তো

অবাক ! এ টাকার আশা তারা ছেড়েই দিয়েছিলেন। তাছাড়া আইন অনুসারে এ টাকা তাদের দাবী করারও অধিকার ছিল না। আর মোট টাকাটাও কম না, চৌষট্টি হাজার টাকার মত। তারা দু'হাত তুলে সাধু সাধু করতে লাগলেন। হাইকোর্টের ইংরেজ বিচারপতিও অবাক হয়ে বললেন, সত্যি, এরকম নজির ওদেশেও দেখা যায় না। চারদিকে জয়জয়কার পড়ে গেল চিত্তরঞ্জনের।

ধন মান যশ—সব পেলেন। সংসারও সুখের সংসার। স্ত্রী বাসন্তা দেবী, একটি মাত্র ছেলে চিররঞ্জন, দুই মেয়ে, জামাই, আত্মীয়স্বজনে ভরা সংসার।

কিন্তু এত যে আয় তবু একটি পয়সাও জমাতে পারতেন না। যা আয় তাই ব্যয়। আসলে টাকা জমানোর কোন ঝোঁকই ছিল না তাঁর। তিনি নিজে খুব বিলাসী ছিলেন। দামী জামা কাপড় ছাড়া পরতে পারতেন না। প্রথম শ্রেণী ছাড়া রেলে চড়তেন না। কিন্তু তাতে আর কত খরচ হতে পারে! আসল খরচ ছিল তাঁর পরের জন্যই। ছেলেবেলা থেকেই কারো অভাব বা দুঃখ তিনি দেখতে পারতেন না। বহুদিন সাধ থাকলেও টাকার অভাবে কিছু করতে পারছিলেন না, কিন্তু এবার হাতে টাকা আসতেই তিনি সমানে দানধ্যান শুরু করলেন।

তাঁর দানের কোন সীমা ছিল না। শুধু এদেশের নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেই এমন দানের নজির খুব কম দেখা যায়।

চিত্তরঞ্জন যদি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নাও আসতেন, তাহলেও এই দানশীলতার জন্যই তাঁর নাম চিরদিন অমর হয়ে থাকত।

আর দানের ব্যাপারে তাঁর কাছে আপনপর বলে কিছু ছিল না। সময় অসময় ছিল না। তাঁর দানের কোন হিসেব নেই, তালিকা নেই। কিছু চাইতে এসে তাঁর কাছ থেকে কেউ খালি হাতে ফিরে গেছে এমন নজির তো নেইই, বরং লোকে যা আশা করে আসত তার অনেক বেশি পেয়ে অবাক হয়ে ফিরে যেত। নিজের হাতে টাকা না থাকলে ধার করেও দান করতেন তিনি। টাকার অভাবে কোথায় সংসার চলছে না, রুগীর ওষুধ কেনা হচ্ছে না, দেনার দায়ে বাড়ি নিলাম হয়ে যাচ্ছে, মেয়ের বিয়ে দিতে পারছে না—সবাই এসে হাজির চিত্তরঞ্জনের কাছে। তা ছাড়া টাকার জন্য কোন জনসেবার কাজ আটকে যাচ্ছে, বিদ্যালয়ের জন্য টাকা চাই, লাইব্রেরীর জন্য কিছু দরকার—চল সব চিত্তরঞ্জনের কাছে। এবং সবাই জেনেই আসত, খালি হাতে ফিরতে হবে না।

কিন্তু এজন্য মনে এতটুকু অহংকার ছিল না তাঁর। কাউকে কিছু দিতে পারলেই যেন শিশুর মত খুশি হতেন। কেউ নিষেধ করলে বলতেন, আমি দিয়ে যদি আনন্দ পাই তোমরা নিষেধ করবে কেন? এই সরলতার সুযোগে মাঝে মাঝে দু'একজন যে তাঁকে

ঠকিয়েও টাকা না নিয়ে যেত তা নয়। কিন্তু তাতেও যেন কোন দুঃখ ছিল না। এজন্য কেউ যদি তাঁকে সাবধান করে দিয়ে বলতেন, দান করবে কর, কিন্তু একটু খোঁজ খবর নিয়ে করা উচিত তো!

চিত্তরঞ্জন শুনে রেগে যেতেন। বলতেন, দান করে সুখ পাই বলে করি, সেজন্য খোঁজ খবরের অফিস খুলে বসতে ভাল লাগে না।

এই দানের জন্য কেউ সামনে প্রশংসা করলেও অসুখী হতেন। একবার একজন তাঁর সামনে বলেছিলেন, সত্যিই, এমন দানের কথা শোনা যায় না।

তিনি মুখ ভার করে জবাব দিলেন, এ তোমাদের ভুল ধারণা। টাকা কি আমার?

লোকটি অবাক হয়ে বলল, আপনি রোজগার করেন, তবে টাকা কার?

চিত্তরঞ্জন বললেন, ভগবান এত টাকা আমাকে দেন কেন? দশ জনের জন্যই আমার হাত দিয়ে দেন।

শুনে সকলেই অবাক হল।

সত্যি, অবাক হবার মতই গল্প সব।

চিত্তরঞ্জনের দুই মেয়েকে গান শেখাতেন একজন নাম-করা গায়ক। মাসে দেড় শ' টাকা বেতন। প্রথম মাসের বেতনের

ওপর চিত্তরঞ্জন খুশি হয়ে আরো দেড় শ' টাকা দিলেন তাঁকে। ভদ্রলোক থতমত খেয়ে গেলেন। একটু অবাকও হলেন। বললেন, বাড়তি টাকাটা কি ভাবে খরচ করব তাও তাহলে বলে দিন আপনি।

চিত্তরঞ্জন একটু হাসলেন। বললেন, আমি যা বলব তা শুনবেন ? তাহলে পথে প্রথম যে ভিখারী আপনার কাছে ভিক্ষা চাইবে তাকে সব টাকাটা দিয়ে দেবেন। দেখবেন তার আশীর্বাদে আপনি এর দশ গুণ টাকা ফিরে পাবেন। না পেলে আমাকে বলবেন, আমি আবার আপনাকে টাকাটা দিয়ে দেব।

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, খুব খুশি মনে তা পারব না। পরে আপনার কাছেও আর চাইতে পারব না।

তবু চিত্তরঞ্জনের এই উদারতা মনে দাগ কাটল তাঁর। তাই বাড়ি ফেরার পথে প্রথম যে ভিখারী সামনে এসে দাঁড়াল তার হাতে একটা দশ টাকার নোট তুলে দিলেন। আর বাড়ি ফিরে অবাক হয়ে দেখলেন, কোনদিন আশা করেন নি এ-রকম একটা জায়গা থেকে তার নামে একশ' টাকা পারিতোষিক এসেছে।

একবার চিত্তরঞ্জনের নিজের জীবনেও এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। একদিন সকালে এক পণ্ডিত এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন হাত জোড় করে। মেয়ের বিয়ের জন্য কিছু সাহায্য চান। চিত্তরঞ্জন এক হাজার টাকার একটা চেক্ লিখে তাঁর

হাতে দিলেন। সামনে সূর্যবাবু নামে একজন পরিচিত ভদ্রলোক বসেছিলেন। তিনি পণ্ডিতের হাত থেকে চেকটা নিয়ে দেখে বললেন, দেখুন তো বোধহয় ভুলে এক শ'র জায়গায় এক হাজার লিখে ফেলেছেন।

চিত্তরঞ্জন একটু হেসে বললেন, না, আমি দেখেই দিয়েছি। ওটা দিয়ে দিন ওঁকে।

লোকটি চলে গেলে ভদ্রলোক বললেন, দেখুন, দান করা ভাল, কিন্তু এভাবে দান করলে শুধু খেটেই মরতে হবে।

চিত্তরঞ্জন হেসে বললেন, কে কার টাকা দেয় বলুন।

বিকেলে কয়েকজনের সংগে বসে গল্প করছেন, সূর্যবাবুও আছেন সেখানে। হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম এসে হাজির। সেটা পড়ে সূর্যবাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন চিত্তরঞ্জন। সূর্যবাবু পড়তে লাগলেন সেটা। একটা মামলার ডাক এসেছে। দৈনিক দেড় হাজার টাকা ফি।

চিত্তরঞ্জন হেসে বললেন, সূর্যবাবু হেরে গেলেন যে। দেনেওয়ালা ভগবান। আমার কি সাধ্য আমি দান করি।

মাঝে মাঝে দানের বহর দেখে মনে হত বোধহয় পাগল হয়ে গেছেন। একবার একটা মামলা থেকে এক লক্ষ টাকা ফি এল। তোড়ায় তোড়ায় বাঁধা নগদ রূপোর টাকা। দশ জন লোক বসে গেল টাকা গুনতে। চিত্তরঞ্জন বললেন, তোমরা যে যত পার

এক আজ্‌লা করে তুলে নাও। একজন চুপ করে পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। চিত্তরঞ্জন বললেন, কৈ, আপনি নিলেন না ?

তিনি তখন এত অবাক হয়ে গেছেন যে মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। চিত্তরঞ্জন বুঝলেন বোধ হয়। নিজে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে দুই আজ্‌লা টাকা তুলে দিলেন।

এ রকম যে কত গল্প আছে তার হিসেব নেই। বললে ফুরোয় না। আর এ তো গেল খুচরো দান। প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে বহু লোকের নামে যে টাকা পাঠাতেন তার পরিমাণই হাজার দুয়েক টাকা। ডাকঘরের লোক ঠাট্টা করে বলত, এবার আপনার বাড়িতে একটা শাখা অফিস খুলতে হবে।

কিন্তু এত যে যশ মান টাকা, তবু মনের কোণে গোপনে ছোট্ট একটা দুঃখ লুকিয়েছিল চিত্তরঞ্জনের। যতটা সাধ ছিল ততটা সাহিত্যের সেবা করতে পারছেন না।

একবার দুঃখ করে একজনকে বলেছিলেন, ছিলেম কবি, হলেম ব্যারিস্টার।

আজ জননেতা হিসেবে, ব্যারিস্টার হিসেবেই সবাই চেনে তাঁকে। কিন্তু সাহিত্যসেবার সুযোগ পেলে আজ কবি হিসেবেই হয়তো সারা দেশ চিনত তাঁকে।

কবিতা লেখার ঝোঁক ছিল তাঁর ছেলেবেলা থেকেই।

স্কুলে থাকতেই কবিতা লিখতেন তিনি। কবিতা পড়তেও খুব ভালবাসতেন। শুধু দেশী নয়, বিদেশী কবিতা ও সাহিত্যও তিনি পড়তে শুরু করেছিলেন অনেক কম বয়স থেকেই।

একসময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অনেক কবিতা লিখতেন চিত্তরঞ্জন। ব্যারিস্টার হয়ে ফেরার পর তাঁর প্রথম কবিতার বই বেরোয়—'মালঞ্চ'। কবিতা লেখা না ছাড়লেও দ্বিতীয় বই বেরোয় প্রায় আঠার বছর পর। নাম 'সাগরসঙ্গীত'। তারপর একে একে 'মালা', 'অশোকগুচ্ছ', 'অন্তর্যামী', 'কিশোর-কিশোরী'।

কবিতা লিখেও তিনি কম যশ পান নি জীবনে। আবার অপযশও কুড়িয়েছেন। অপযশ কবিতা খারাপ বলে নয়, ধর্মের বিচারে। তাঁর নিজের সমাজ, ব্রাহ্ম সমাজের বহু নেতা তাঁর কবিতার ভেতর ধর্মবিরোধী মনোভাব খুঁজে বের করে খুব চটে যান তাঁর উপর। তাঁরা এত চটে গিয়েছিলেন যে চিত্তরঞ্জনের বিয়েতে পর্যন্ত আসেন নি তাঁরা।

কিন্তু লেখক হিসেবে প্রশংসা পেয়েছিলেন তখনকার অনেক বড় বড় লোকের কাছ থেকে। এমন কি শরৎচন্দ্রের মত লেখকের কাছ থেকেও।

শুধু কবিতা নয়, প্রবন্ধও লিখেছেন তিনি অনেক। কয়েকটি ছোটগল্পও।

বিলাতে থাকতে তিনি একটা ইংরেজি নাটক লিখতে শুরু করেছিলেন। নাটকটা এত ভাল হচ্ছিল যে ওদেশের একজন নাম-করা অভিনেতা ওটা শেষ করে দেবার জন্য অনুরোধ করেছিল চিত্তরঞ্জনকে। কিন্তু নাটকটা নানা কাজে শেষ পর্যন্ত আর শেষ করতে পারেন নি তিনি।

গান বাজনাও বিশেষ ভালবাসতেন তিনি। কিছু কিছু গানও লিখেছেন একসময়।

শুধু যে লিখতেন তাই নয়, 'নারায়ণ' নামে একটি পত্রিকাও বের করেছিলেন তিনি। নিজেই সম্পাদক ছিলেন। তখনকার নাম-করা লেখক বা নেতাদের অনেকেই লিখতেন সে কাগজে। তিনি নিজেও রাজনীতি, সমাজ বা ধর্মের উপর অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন সেখানে। তিনি যে দেশের কথা, দেশের মানুষের কথা কত গভীরভাবে ভাবতেন তা সেই সব লেখা থেকেই বোঝা যেত।

আর দেশের কথা এত ভাবতেন বলে, দেশের মানুষকে এত ভালবাসতেন বলেই সব সময় মনে মনে দুঃখ বোধ করতেন, দেশের কাজ যতটা করা উচিত তা করতে পারছেন না। একদিন একজনকে দুঃখ করে বলেছিলেন, দেখ, আদালতে ব্যারিস্টারী করতে গেলে দেশের কাজ করা চলে না। এ বছর পাঁচ লাখ টাকা রোজগার করলাম কিন্তু একটা পয়সাও বাঁচে না। নিজের

জন্য ভাবিনা, কষ্ট কি প্রথম জীবনেই কম দেখেছি? কিন্তু একটা ভাবনা হয়, অনেকগুলো লোক আমার কাছে মাসিক সাহায্য পায়, সে বেচারাদের কি হবে।

এত নাম যশ অর্থ—কিন্তু মনে শান্তি নেই। একটা করে মামলা জেতেন আর মনে মনে ছটফট করেন, আমার সব ক্ষমতা আমি টাকার জন্য ক্ষয় করছি, দেশের কাজে লাগাতে পারছি না।

একবার ভাবেন সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আবার ভাবেন, এতগুলো লোক আমার উপর নির্ভর করে আছে, তাদের কি হবে?

তাঁর লেখা একটা কবিতা আছে ঃ

কোথা পথ? কোথা পথ? খুঁজিছি সতত।
তবু পথ নাহি মিলে দিশেহারা মন।

তাঁর নিজের তখন সেই অবস্থা।

অবশ্য রাজনীতির ভেতর ঝাঁপিয়ে না পড়লেও রাজনীতি থেকে খুব দূরেও ছিলেন না তিনি। তখনকার দিনের বড় বড় অনেকের সঙ্গেই যোগাযোগ ছিল। রাজনীতি নিয়ে চিন্তাভাবনাও করতেন। রাজনৈতিক আন্দোলনকে যেভাবে যতটুকু পারেন সাহায্য করতেন। তখনকার সবচেয়ে বড় জাতীয় দল কংগ্রেসের রাজনীতি তখন খুবই নরম ছিল। বলতে গেলে ইংরেজ শাসকদের কাছে আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি। সে নীতির

সংগে পুরোপুরি মনের মিল না থাকলেও কংগ্রেসের অধিবেশন-গুলোতে প্রায় নিয়মিতভাবেই যোগ দিতেন।

কিন্তু খুব বেশীদিন তিনি নিজেকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে পারলেন না। বিদেশী শাসকদের অবিচারে অত্যাচারে তখন গোটা দেশ জাগতে শুরু করেছে। দাবী করছে, আমাদের দেশ আমরাই শাসন করব, আমাদের সে অধিকার দেওয়া হোক।

আর এই জাগরণের মুখে বিরাট আলোড়ন নিয়ে দেশের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন এক বিরাট পুরুষ— মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। ছোটখাট রোগা একটি মানুষ, কিন্তু সাহসে যেন একটি আগুনের শিখা। গোটা দেশ জাতির নেতা হিসেবে মাথায় তুলে নিয়েছে তাঁকে। নতুন জোয়ার এসেছে স্বাধীনতা আন্দোলনে।
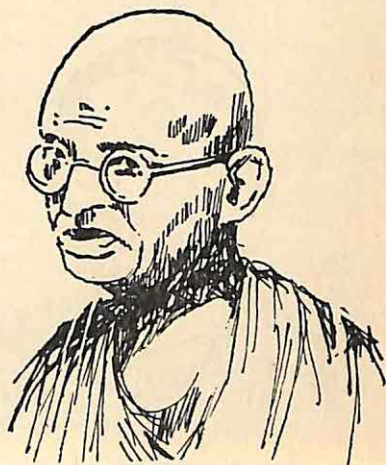
মনে অধীর হয়ে ওঠেন চিত্তরঞ্জন। গোটা দেশ জেগে উঠেছে, শেকল ছেড়ার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে মানুষ। এখনও কি তিনি নিজের কথা ভেবে দূরে বসে থাকবেন?

অনেক ভাবলেন। সবদিক বিচার করে দেখলেন। তারপর মন ঠিক করলেন তিনি, আর দূরে থাকা চলে না। দেশ তাঁকে আকুলভাবে ডাকছে—সে ডাক এড়িয়ে যাওয়া পাপ।

সরাসরি রাজনীতিতে নেমে এলেন চিত্তরঞ্জন ১৯১৭ সালে।

কেন এলেন আরো ভাল করে জানতে হলে তার আগের কিছু কথা জানতে হয়।

১৯১৪ সালের শেষের দিকে প্রায় গোটা পৃথিবী জুড়ে একটা বিরাট লড়াই শুরু হয়েছিল। প্রায় পাঁচ বছর চলেছিল সে লড়াই। ইতিহাসে তার নাম 'প্রথম মহাযুদ্ধ'। ইংরেজরা এই লড়াইয়ে ভীষণ ভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। তাদের তখন অনেক লোক, বহু টাকার দরকার। আর দরকার গায়ের জোরে দখল করে রাখা দেশগুলোর সমর্থন।

তাই বিপদে পড়ে তারা ঘোষণা করল, ভারতীয়রা এই

লড়াইয়ে তাদের সমর্থন করলে তারা দেশ শাসনের সুযোগ সুবিধে করে দেবে ভারতীয়দের। ভারতবর্ষ তাদের বিশ্বাস করে প্রচুর টাকাকড়ি তুলে দিল। পনের লক্ষ সেনা লড়তে গেল তাদের হয়ে। এক লক্ষ সেনা তাদের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিল।

কিন্তু ছলনায় ইংরাজদের তুলনা নেই। তারা আজ কাল করে করে কিছু সময় কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত ১৯১৭ সালে ভারত সচিব মন্‌টেগু সাহেবকে সদলে এদেশে পাঠাল সরজমিনে তদারক করার জন্য। মন্‌টেগু সাহেব ভারতীয়দের কতটুকু দেশ শাসনের অধিকার দেওয়া যায় তা বিচার করে দেখার জন্য অনেক জায়গায় ঘুরে অনেক নেতার সাথে আলোচনা করলেন। কোন কোন নেতা নিজেরা সেধে গিয়েও দেখা করলেন। চিত্তরঞ্জনকেও তারা মন্‌টেগু সাহেবের সাথে গিয়ে দেখা করার জন্য বললেন। কিন্তু তেজী চিত্তরঞ্জন বললেন, আমি সেধে গিয়ে কিছুতেই ওদের সঙ্গে দেখা করব না। শেষ পর্যন্ত মন্‌টেগু সাহেব সাদরে ডেকে পাঠালেন চিত্তরঞ্জনকে। এ বিষয়ে তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। চিত্তরঞ্জন অকপটে জানিয়ে দিলেন, ছিটেফোঁটা কোন সুযোগ মেনে নিতে তিনি রাজী নন। পুরো শাসনভার ভারতীয়দের হাতে তুলে দিতে হবে।

কিন্তু এ বিষয়ে সব নেতাদের একমত ছিল না। কংগ্রেসের ভেতর তখন দুটো দল হয়ে গেছে। নরম দল ও চরম দল। নরম

দল বললেন, যেটুকু পাওয়া যায় সেটুকুই মেনে নেওয়া ভাল। তারপর ধীরে ধীরে চাপ দিয়ে বাকীটুকু আদায় করা যাবে। কিন্তু চরম দল বললেন, দেশের শাসনবিধি তৈরী করার ও দেশ শাসনের পুরো ভার এই সুযোগে আদায় না করতে পারলে আর হবে না। এ বিষয়ে কোন আপোস করা চলবে না। চিত্তরঞ্জন ছিলেন চরম দলে।

মন্‌টেগু সাহেব তাঁর কাজ সেরে দেশে ফিরে গেলেন। ওই দেশের প্রধানমন্ত্রী চেমসফোর্ডের কাছে আলোচনা করলেন। তারপর ভারতের নতুন শাসনবিধির একটা খসড়া রচনা করলেন। সে খসড়ায় ভারতীয়রা যা চেয়েছিল তার প্রায় কিছুই দেওয়া হল না।

গোটা দেশ জুড়ে দারুণ হতাশা নেমে এল। চরম দলের নেতারা প্রতিবাদ জানালেন। রাগে গর্জে উঠলেন চিত্তরঞ্জন, এ ছেলে-ভুলানো অধিকার আমরা চাই না।

রাজনীতি থেকে আর দূরে থাকতে পারলেন না চিত্তরঞ্জন। সভার পর সভায় তিনি তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানাতে শুরু করলেন। জনসাধারণকে তাঁর কথা বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। আন্দোলনের জন্য তৈরী করতে লাগলেন দেশকে।

শুধু বাইরেই নয়, দলের ভেতরেও তাঁর সমান সাহসের সংগে লড়তে হচ্ছিল নরম দলের নেতাদের সাথে। এবং এখানেও

তিনি জয়ী হলেন। কংগ্রেস অধিবেশনে নরম দলকে পরাজিত করে পূর্ণ স্বরাজের দাবী পাশ করিয়ে নিলেন।

কিন্তু ইংরেজ সরকার সে দাবী মেনে নেওয়া দূরে থাক, ভারতীয়দের দাবিয়ে রাখার জন্য নতুন নতুন উপায় বের করতে লাগলো। ১৯১৯ সালে তারা 'রাওলাট আইন' নামে একটা কঠোর ও ঘৃণ্য আইন জারী করল। আবার প্রতিবাদ উঠল চারদিকে। গান্ধীজী সত্যাগ্রহ শুরু করলেন। সারা ভারত জুড়ে একদিন হরতাল পালন করা হল।

জবাবে কয়েক জায়গায় জনতার উপর গুলি চালালো পুলিশ। কিন্তু সব ইতিহাসকে ছাড়িয়ে গেল জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম হত্যালীলা। প্রায় দশ হাজার হিন্দু-মুসলমান-শিখ নরনারী একটি প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়েছিল সেই বাগে। আচমকা জেনারেল ডায়ার সৈন্য নিয়ে সেখানে হাজির হলেন। জনতার বেরুবার সব পথ আটকে দিয়ে, নির্মমভাবে গুলি চালাতে শুরু করেন সেই জনতার উপর। প্রায় এক হাজার লোককে সেখানেই হত্যা করা হয়।

এই সংবাদে গোটা দেশ চমকে উঠল। দারুণ রোষে ফেটে পড়ল মানুষ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই অত্যাচারের প্রতিবাদে 'নাইট' উপাধি বর্জন করলেন। কংগ্রেস থেকে

সত্য বিবরণ জানার জন্য একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হল। চিত্তরঞ্জনকে তার একজন সদস্য করা হল। ইংরেজ সরকারের প্রবল বাধা এড়িয়ে চিত্তরঞ্জন সেই নির্মম অত্যাচারের সত্যি বিবরণ সংগ্রহ করলেন। আর তাঁর বিবরণ থেকেই গোটা পৃথিবী জানতে পারল সেই নির্মম হত্যালীলার সঠিক সংবাদ।

গোটা দেশ রাগে, ঘৃণায় থরথর করে কেঁপে উঠল। মহাত্মা গান্ধী দেশ জুড়ে 'অসহযোগ আন্দোলনের' ডাক দিলেন। এই আন্দোলনের মূলকথা, সরকারের সংগে সব দিক দিয়ে সহযোগিতা বর্জন করা। এবং বিদেশী জিনিস বয়কট করা।

কিন্তু এতে আপত্তি জানালেন চিত্তরঞ্জন। চিত্তরঞ্জনের কাছে নেতার চেয়েও বড় ছিল নিজের বিবেক। সব দিক বিচার করে গান্ধীজীর এই ডাককে তাঁর অসময়োচিত বলে মনে হল। তিনি গান্ধীজীর মত একজন নেতার বিরোধিতায়ও ভয় পেলেন না। এমন কি নিজের মত কংগ্রেসে গ্রহণ করাতেও পারলেন না

বলে কংগ্রেস ছেড়ে দেবার কথা পর্যন্ত ভাবলেন। তাঁর জীবনে আপোসের কোন জায়গা ছিল না।

কিন্তু অহেতুক কোন জেদও যে তাঁর ছিল না তার প্রমাণ পাওয়া গেল কয়েক মাস পরে। কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে। এ কয়মাস আরো ভাল করে ভেবে দেখবার সময় পেয়েছিলেন তিনি। সব দিক চুলচেরা বিচার করে দেখার সময় পেয়েছিলেন।

সকলেই ভেবেছিল চিত্তরঞ্জন এখানে আরো তীব্র বিরোধিতা করবেন গান্ধীজীর। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিনি গান্ধীজীর 'অহিংস অসহযোগ আন্দোলনকে' পূর্ণ সমর্থন জানালেন।

এবং শুধু তাই নয়, তিনি ঠিক করলেন জীবনের সব কিছু ত্যাগ করে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বেন এবার। যশ, সুখ, অর্থ—সব কিছুর মোহ ছেড়ে, সব কিছু পিছনে ফেলে, দেশমাতার ডাকে পথে নেমে আসার সময় এসেছে তাঁর।

নাগপুর অধিবেশনেই ঘোষণা করলেন তিনি, দেশের কাজের জন্য সময় প্রয়োজন, তাই আইন ব্যবসাও ছেড়ে দেবেন তিনি।

গোটা দেশ শুনে চমকে উঠল। আইন ব্যবসায় যাঁর

মাসিক আয় ষাট-পয়ষট্টি হাজার টাকা তিনি আইন ব্যবসা ছেড়ে দেবেন দেশের জন্য !

চিত্তরঞ্জন কলকাতায় ফিরে এলেন। ভীড় করে এল বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন আর মক্কেলরা। সকলেই নিষেধ করতে লাগলেন, এত আয়ের ব্যবসা ছেড়ে দিলে তোমার চলবে কি করে ? মক্কেলরা কেউ কেউ কেঁদে ফেলল, আমাদের তাহলে কি হবে স্যার ?

সবার নিষেধ দুর্বল করে ফেলল চিত্তরঞ্জনকে। মহা ভাবনায় পড়লেন। রাতের ঘুম পর্যন্ত কেড়ে নিল এই ভাবনা। চোখমুখ বসে গেল।

একদিন সকালে বাসন্তী দেবী ধীর পায়ে পাশে এসে দাঁড়ালেন। শান্ত ভাবে বললেন, তুমি এত ভাবছ কেন ? ব্যবসা যখন ছাড়বে ভেবেছ তখন ছেড়ে দেওয়াই ঠিক। আমাদের যেমন করে চলে চলবে, না হয় শাক ভাত খেয়ে কাটাব। সেজন্য ভেব না তুমি।

নতুন করে যেন সাহস ফিরে পেলেন চিত্তরঞ্জন। মন ঠিক করে ফেললেন। এবং শুধু ব্যবসা নয়, এতদিনের সুখ, বিলাস-ব্যসন, এমন কি চুরুট তামাকের নেশা পর্যন্ত ছেড়ে সর্বত্যাগী ফকিরের মত দেশের কাজে নেমে এলেন।

গোটা দেশ দু'হাত বাড়িয়ে বরণ করে নিল তাঁকে। এতদিন

তাঁরই মত একজনের পথ চেয়ে বসেছিল যেন সবাই। যিনি এসে নতুন প্রেরণায় জাগিয়ে তুলবেন দেশকে। পথ দেখাবেন বিরাট জনতাকে।

মহাত্মা গান্ধীর জয়ধ্বনিতে মুখরিত দেশ এবার নতুন জয়ধ্বনিতে বরণ করল চিত্তরঞ্জনকে। অসহযোগ আন্দোলনের বন্যায় ভেসে গেল দেশ। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত কেঁপে উঠল বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে।

চিত্তরঞ্জনের ডাকে হাজার হাজার তরুণ সরকারী বিদ্যালয়, ও কলেজ থেকে বেরিয়ে এল, উকিল মোক্তাররা আদালত ছেড়ে বেরিয়ে এলেন, চাকুরেরা সরকারী চাকরি ছেড়ে দিলেন। কংগ্রেস কর্মীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে গ্রামবাসীদের হাতে চরকা তুলে দিল। কুড়ি লক্ষ চরকা ঘুরতে শুরু করল দেশের ছেলেমেয়েদের হাতে।

বীর সেনাপতির মত পথ দেখিয়ে চললেন চিত্তরঞ্জন। দেশের লোক ভালবেসে চিত্তরঞ্জনকে নতুন উপাধিতে ভূষিত করল—দেশবন্ধু। চিত্তরঞ্জন হলেন 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।'

দেশ তো শুধু সহর নয়, দেশের প্রাণ হল দেশময় ছড়িয়ে-থাকা হাজার হাজার গ্রাম। চিত্তরঞ্জন এবার তাই গ্রামে গ্রামে স্বাধীনতার বাণী ছড়িয়ে দেবার জন্য সফরে বেরুলেন। প্রথমেই গেলেন পূর্ব বাংলায়।

পূর্ব বাংলা ‘চিত্তরঞ্জন কি জয়’ ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল। যেখানেই তিনি পা দিলেন সেখানেই দারুন সাড়া পড়ে গেল। ধনী দরিদ্র, হিন্দু মুসলমান হাজার হাজার লোক এসে জড়ো হল তাঁর চারপাশে। তিনি যে পথে যেতেন তার প্রতিটি স্টেশনে তাঁকে দেখবার জন্য বিরাট ভীড় জমে থাকত।

সাধারণ লোক যে তাঁকে কত ভালবাসত তা বোঝা যায় ছোট্ট একটা ঘটনা থেকে। চাঁদপুর থেকে আসাম যাবার পথে রাত চারটায় একটা স্টেশনে গাড়ী থামতেই বিরাট চেহারার এক পাঞ্জাবী গাড়ীতে লাফিয়ে উঠল। বলল, দেশবন্ধু কোথায় ? বাসন্তী দেবীও সেই গাড়ীতে ছিলেন। তাঁরা সকলেই ভয় পেয়ে গেলেন। লোকটি বুঝল বোধ হয়। বলল, দেশবন্ধুকে দেখব বলে আমরা সাতদিনের পথ এসেছি। চিড়া খেয়ে দু'দিন বসে বসে আছি এখানে। আমরা তাঁকে দেখতে চাই।

চিত্তরঞ্জন তখন উপরের গদীতে শুয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সকলে তাঁকে তুলতে নিষেধ করল। কিন্তু কে কার কথা শোনে। লোকটি হাত বাড়িয়ে দেশবন্ধুকে উপর থেকে নামিয়ে আনল। তারপর দু'হাত দিয়ে তুলে বাইরের সবাইকে দেখাতে লাগল।

সাধারণ মানুষের এই ভালবাসাই ছিল চিত্তরঞ্জনের জোর। আর জোর ছিল তাঁর কথায় দেশের জন্য হাসতে হাসতে প্রাণ দিতে পারে এমন খাঁটি সহকারীরা।

ইতিমধ্যে বিলাত থেকে ফিরে এসে তাঁর সহকারী হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্রের মত একজন যোগ্য বীর সহযোগী পেয়ে চিত্তরঞ্জনের জোর যেন শতগুণে বেড়ে গেল। কিছুদিনের ভেতরই তাঁর প্রেরণায় সুভাষচন্দ্র দেশের তরুণদের দিয়ে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুললেন। এবং আন্দোলন পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতার কথা লোকে বুঝতে পারল, ইংলণ্ডের যুবরাজের ভারত আগমনের প্রতিবাদে কলকাতায় যে

ঐতিহাসিক হরতাল পালিত হয়, তাতে। এমন সফল হরতাল কলকাতায় খুব কমই হয়েছিল। গোটা সহর সেদিন কংগ্রেসের মুঠোয় চলে এসেছিল যেন।

কিন্তু এই অভূতপূর্ব সফলতায় ইংরেজ সরকার ভয় পেয়ে গেল। কঠোর হাতে এই আন্দোলন দমন করার জন্য এগিয়ে এল তারা। বেআইনী ঘোষণা করল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে। চিত্তরঞ্জন

তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। এই আইনকে বেআইনী বলে ঘোষণা করলেন।

শুধু তাই নয়, কংগ্রেস-আন্দোলনের তিনি মোড় ফেরালেন নতুন এক পথে। শুরু হল 'আইন অমান্য আন্দোলন'। সরকারের বেআইনী আইন না-মানার আন্দোলন।

চারদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। আন্দোলন চালানোর জন্য মাত্র কয়েকদিনের ভেতরই দুই কোটি টাকা চাঁদা তুলে ফেলা হল। হাজার হাজার নরনারী এসে নাম লেখাতে লাগল কংগ্রেসের খাতায়।

সাজ সাজ রব পড়ে গেল সরকারী মহলেও। যেমন করে হোক, যত অত্যাচার করে হোক, এই আন্দোলনকে দমাতেই হবে।

তারপর একদিন বন্দেমাতরম্ রবে আকাশ বাতাস মুখরিত করে শুরু হল সেই আন্দোলন। মানব না, বিদেশী সরকারের বেআইনী আইন মানব না আমরা।

চিত্তরঞ্জনের একমাত্র ছেলে এগিয়ে এলেন, সত্যাগ্রহী হবেন। সকলেই নিষেধ করল তাঁকে। কিন্তু শুনে দারুন খুশি হলেন চিত্তরঞ্জন। আনন্দে চোখ ছলছল করে এল তাঁর। বললেন, ওকে নিষেধ করছ কেন? ও ঠিকই করছে। আমার নিজের ছেলে না গেলে আমি অন্যের ছেলেদেরই বা ডাক দেব কি করে?

ছেলে যেদিন কারাবরণ করতে যায় সেদিন কী খুশি চিত্তরঞ্জন। রসিকতা করে নাতনীকে আদর করে বললেন, মিনু, তুইও যাবি ?

বিকেলে খবর পাওয়া গেল চিররঞ্জন গ্রেপ্তার হয়েছে। তাদের গাড়ীতে তুলবার সময় নির্মমভাবে লাথি ঘুষি মেরেছে পুলিশ। কিন্তু এ খবরেও একটু বিচলিত হলেন না চিত্তরঞ্জন।

পরদিন সত্যাগ্রহে বেরুলেন স্ত্রী বাসন্তী দেবী ও বোন উর্মিলা দেবী। পথে আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার হলেন তাঁরা। গোটা সহর যেন শুনে চমকে উঠল। দলে দলে লোক ছুটতে শুরু করল আদালতের দিকে। আনন্দের ও গর্বের হাসি ফুটে উঠল চিত্তরঞ্জনের মুখে।

আরো মরিয়া হয়ে উঠল পুলিশ। সত্যাগ্রহী দেখলেই তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল তারা। দলে দলে লোক ধরে জেলে পুরতে লাগল। জেলগুলো দেখতে দেখতে ভরে গেল। নতুন জেলখানা খুলতে হল দমদমে। তাও একসময় ভরে গেল। খোলা হল আরো জেল। কিন্তু তাতেও কুলোয় না।

শেষ পর্যন্ত একদিন লাটসাহেব আলোচনার জন্য ডেকে পাঠালেন চিত্তরঞ্জনকে। অনেকেই ভেবেছিল, সরকার এবার আপোস করতে চাইবে বোধহয়। কিন্তু তার বদলে লাটসাহেব চিত্তরঞ্জনকে সরাসরি আদেশ দিলেন, হরতাল বন্ধ করার আয়োজন করুন আপনি।

চিত্তরঞ্জনও সরাসরি জবাব দিলেন, এদের বাধা দেব কি করে? এরা তো কোন অন্যায় কাজ করছে না, ধর্মকাজ করে যাচ্ছে এরা। আপনাকে আমি নিষেধ করলে আপনি গির্জায় যাওয়া বন্ধ করতে পারবেন?

লাটসাহেব তাঁর সাহস দেখে অবাক হলেন। তবু শেষ বারের মত ভয় দেখিয়ে বললেন, তবে কি এসব কাজ আপনি চালিয়েই যাবেন? তাহলে আমাকেও কিন্তু শান্তি বজায় রাখার জন্য কাজ করতে হবে।

এ-কথার মানে কি চিত্তরঞ্জন বেশ বুঝলেন। তিনি ফিরে এসে তৈরী হতে লাগলেন। তিনি জেলে গেলেও কি ভাবে কাজ চলবে তাও সব ঠিকঠাক করে দিলেন।

কয়েকদিন পরেই একদিন পুলিশ এসে হাজির হল তাঁর বাড়ীতে। হাসিমুখে গ্রেপ্তার বরণ করলেন তিনি। বিচারের সময়ও কোন প্রতিবাদ জানালেন না। বিচারে ছয় মাস জেল হল তাঁর।

কত পরিশ্রম, কত অনিয়ম আর সইতে পারে শরীর? জেলে এসে তিনি রোগের কবলে পড়লেন। তার ভেতর বড় হয়ে দেখা দিল ডায়েবেটিস আর দাঁতের বেদনা। শেষ পর্যন্ত কয়েকটা দাঁত তুলে ফেলতে হল তাঁর। অসুখের ফলে দেহের ওজন কমতে শুরু করল।

সে বছর কংগ্রেসের অধিবেশন বসল আমেদাবাদে। চিত্তরঞ্জন সভাপতি নির্বাচিত হলেন। কিন্তু তিনি জেলে থাকায় অধিবেশনে তাঁর অভিভাষণ পড়ে দিলেন সরোজিনী নাইডু।

ছ'মাস পর জেল থেকে ছাড়া পেলেন চিত্তরঞ্জন। তাঁকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য বিরাট সভার আয়োজন করা হল। জনতা আবার বুকে তুলে নিল তাদের প্রিয় নেতাকে।

কিন্তু তিনি জেলে থাকার সময়েই কংগ্রেসের ভেতর ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসের প্রবেশ করা উচিত কিনা তাই নিয়ে বাদানুবাদ শুরু হয়েছিল। দুটো দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিলেন নেতারা। এক দল বললেন, সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য হলে অসহযোগ আন্দোলন অর্থহীন হয়ে পড়বে। অপর দল বললেন, ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করে ভেতর থেকে অসহযোগ আন্দোলন চালাতে হবে। এতে দেশসেবার আরো বেশী সুযোগ পাওয়া যাবে।

দুই দলের বিবাদ চরমে উঠতে শুরু করল। তাঁদের চুলচেরা তর্কে সাধারণ মানুষ কিছুটা দিশেহারা হয়ে পড়ল।

দেশবন্ধু জেল থেকে বেরিয়ে এসে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের অনুকূলে মত দিলেন। কিছুদিন পরই গয়ায় কংগ্রেস অধিবেশন হল। সভাপতি নির্বাচিত হলেন চিত্তরঞ্জন। তিনি তাঁর ভাষণে

বিশেষ জোর দিয়ে তাঁর কথা সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন।

কিন্তু অন্য দলের কাছে শেষ পর্যন্ত হেরে গেলেন তিনি। বিরোধী দল সংখ্যায় অনেক বেশী ছিলেন। বাধ্য হয়ে সভাপতির পদ ত্যাগ করতে হল তাঁর। অনেক বিরূপ সমালোচনা শুনতে হল। বেশ কিছু নিন্দাও শুনতে হল। কিন্তু নিজের মতে অবিচল থাকলেন তিনি। নিজের বিবেকের দেখানো পথ থেকে একচুলও সরলেন না। বরং আরো কঠোর হলেন। মতিলাল নেহেরু, বিঠলভাই প্যাটেল ও অন্যান্য বড় বড় কয়জন নেতার সমর্থনে নতুন এক দল গড়লেন তিনি—স্বরাজ্য দল।

তারপর সভাসমিতিতে ঘুরে ঘুরে চারদিকে নিজের নতুন মতবাদের কথা লোককে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। ‘ফরোয়ার্ড’ নামে একটা নতুন ইংরাজী কাগজও বের করলেন। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে মানুষের মনকে তৈরী করতে লাগলেন সেই কাগজের ভেতর দিয়ে। তাঁর অসাধারণ উদ্যমে স্বরাজ্য দল দিনে দিনে বাড়তে শুরু করল।

অবশেষে কংগ্রেসের ভেতরেও জয় হল চিত্তরঞ্জনের। কংগ্রেস মত দিল কোন সদস্য ইচ্ছে করলে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করতে পারেন।

চিত্তরঞ্জনের মনের জোর শতগুণ বেড়ে গেল। ব্যবস্থাপক

সভার নির্বাচনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। আহার নেই, ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই। অনেক সময় নানা সভায় দাঁড়িয়ে একনাগাড়ে দশ বার ঘণ্টাও ভাষণ দিয়েছেন তিনি।

ফলে নির্বাচনের পর দেখা গেল প্রায় সব জায়গায়ই স্বরাজ্যদল জয়ী হয়েছে। বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় দল হিসেবে তাঁর দল ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করল। মন্ত্রিসভা গঠনের ডাক পেয়েও তিনি তা গ্রহণ করলেন না। সরকার দেশ শাসনের পুরো ক্ষমতা দিতে রাজী হল না বলে। সরকার-বিরোধী দল হিসাবে যোগ দিলেন তাঁরা।

এবং বিরোধী দল হিসেবে কাজ করে তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে ব্যবস্থাপক সভার ভেতর থেকেও সার্থক ভাবে দেশসেবা করা যায়। জনবিরোধী কোন আইন সরকার থেকে পাশ করবার চেষ্টা হলেই তাঁরা বাধা দিতেন। নাকচও করে দিতেন অনেক সময়। এবং শেষ পর্যন্ত কোন কোন প্রদেশে শাসনব্যবস্থাই অচল করে দিলেন চিত্তরঞ্জন।

তিনি ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেই আর একটি কাজ করেছিলেন—হিন্দু-মুসলমান চুক্তি। তিনি বুঝেছিলেন যে একই দেশের অধিবাসী হিসেবে আমাদের সুখ-দুঃখ একই সাথে বাঁধা। অথচ কতকগুলি সামাজিক বিবাদ আমাদের আলাদা করে রেখেছে। সুতরাং সেই বিবাদের মূলগুলো দূর করতে না পারলে ইংরেজকে

বাধা দেওয়া যাবে না। অবশ্য এই চুক্তি করতে গিয়েও তিনি অনেক বাধা পেলেন। তাঁর বদনাম রটাল কিছু লোক। কিন্তু জীবনে কোন বাধাকেই বাধা বলে মানতেন না তিনি। শেষ পর্যন্ত তাই জয় হল তাঁর। বিবেক আর মনের জোরের জন্যই জয় ছিল তাঁর হাতের খেলনা।

সেটা নতুন করে প্রমাণ হল আবার কর্পোরেশনের ব্যাপারে। কর্পোরেশনের কাজে অনেক গলতি ছিল তখন। এবার তাঁর নজর গেল সেদিকে।

এই সময় নতুন একটা আইনে কর্পোরেশনের স্বায়ত্বশাসনের অধিকার মেনে নেওয়া হয়েছিল। এবং 'মেয়র' পদটি তৈরী হয়েছিল। কর্পোরেশনকে দখল করার জন্য সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে নির্বাচনে নামলেন তিনি। এবং ফলাফল বেরুলে দেখা গেল কংগ্রেস সবার চেয়ে বেশী আসন দখল করে নিয়েছে। কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র নির্বাচিত হলেন চিত্তরঞ্জন। এবং প্রধান কর্মসচিবের ভার দেওয়া হল সুভাষচন্দ্রকে।

কর্মভার হাতে নিয়েই নাগরিকদের নানারকম সুখসুবিধার দিকে নজর দিলেন তিনি। গরীবের ছেলেমেয়েদের বিনা বেতনে লেখা-পড়া শেখার সুযোগ করে দেবার জন্য কর্পোরেশনের খরচে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। কর্পোরেশনের কম আইনের কর্মচারীদের উন্নতির ব্যবস্থা করে দিলেন।

এ-সময়ের আরো দুটি জয় দেশের লোকের কাছে তাঁকে আরো প্রিয় করে তুলল। অনেকদিন ধরেই শুনছিলেন তারকেশ্বরের মোহন্ত ও কর্মচারীরা যারা ওখানে ধর্ম করতে যায় তাদের ওপর অন্যায় জুলুম করে। জোর করে পয়সা কড়ি আদায় করে নেয়। অথচ ধর্মের ভয়ে কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না। এবার তিনি এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করার জন্য এগিয়ে গেলেন। তাঁকে বাধা দেবার জন্যই যেন সরকার মোহন্তদের সমর্থন করে বসল। ব্যাপারটা এতে দারুন ঘোরাল হয়ে উঠল। ফলে বাধ্য হয়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করলেন চিত্তরঞ্জন। দলে দলে ছাত্ররা গিয়ে সেই আন্দোলনে যোগ দিতে লাগল। মোহন্তেরা এসব দেখে দারুন ভয় পেয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত চিত্তরঞ্জনের কাছে পরাজয় মেনে নিলেন তারা। এভাবে অনেক দিনের একটা অন্যায় দূর করলেন তিনি।

পরের ঘটনা ঘটে ফরিদপুরের চর মইনার গ্রামে। একটি ছোট ঘটনায় পুলিশ জনতার উপর অমানুষিক অত্যাচার করেছিল এখানে। দেশের চারদিক থেকে প্রতিবাদ ওঠে এতে। কিন্তু সরকার পক্ষ পুলিশের এই কাজের জন্য তাদের খুব প্রশংসা করল। এমন কি খোদ লাটসাহেব পর্যন্ত পুলিশদের পারিতোষিক বিতরণ সভায় পুলিশের প্রশংসা করে যে ভাষণ দেন তাতে ভারতীয় নারীদের নামে জঘন্য বদনাম দেন। গোটা দেশ এতে

অপমানে ফুঁসে ওঠে। চারদিকে সভা-সমিতি ও আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। চিত্তরঞ্জন তার নেতা। শেষ পর্যন্ত এখানেও চিত্তরঞ্জনের কাছে পরাজয় মেনে নিতে হল লাটসাহেবের। তিনি তাঁর কথার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। চারদিকে জয়জয়কার পড়ে গেল চিত্তরঞ্জনের।

কিন্তু একনাগাড়ে সাত বছরের অমানুষিক পরিশ্রমে চিত্ত-রঞ্জন এবার খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তার পুরো বিশ্রাম নিতে ও বায়ু পরিবর্তনে যেতে বললেন। বাধ্য হয়ে পাটনায় গেলেন চিত্তরঞ্জন। শরীর তখন দারুন দুর্বল। অনেক সময় হাটতে চলতেও অসুবিধে হয়। রাতে ঘুম হয় না। একদিন কাতর ভাবে ডাক্তারকে বলেছিলেন তিনি, ডাক্তারবাবু, না ঘুমিয়ে মারা গেলুম। তিন মাস ঘুমুই নি। কিছু ওষুধ দিয়ে ভাল করতে পারেন ?

ডাক্তারবাবু বললেন, এবার মাথাটাকে একটু বিশ্রাম দিন।

কিন্তু দিন বললেই তো হয় না। রাতদিন মাথায় দেশের ভাবনা। দলের ভাবনা। তাঁর বিশ্রাম কোথায় ?

ভাল করে সুস্থ হবার আগেই এসে পড়ল ফরিদপুরের কংগ্রেস অধিবেশন। তিনি সভাপতি নির্বাচিত হলেন।

ফরিদপুর থেকে যখন ফিরলেন তখন গায়ে জ্বর তাঁর। ডাক্তাররা দেখেশুনে বললেন, ইউরোপের কোন ভাল স্বাস্থ্যকর

জায়গায় যান। কিন্তু এসময় দেশ ছেড়ে যেতে রাজী হলেন না তিনি। আবার পাটনায় গেলেন। শরীর সারছে না দেখে ডাক্তারের পরামর্শে সেখান থেকে দার্জিলিং গেলেন।

এখানে এসে একটু ভাল বোধ করলেন। কিন্তু সেখানেও মাথার বিশ্রাম নেই। দেশের নানা সমস্যার ভাবনার হাত থেকে রেহাই নেই। জরুরী আলোচনার জন্য গান্ধীজী গিয়ে থাকলেন সাত দিন। তারপর গেলেন অ্যানী বেশান্ত।

ঘুষঘুষে জ্বর চলছিলই, হঠাৎ একদিন সকালে জ্বর বেড়ে গেল। সারা শরীরে বেদনা। সারাটা দিন ছটফট করে কাটালেন। পরদিন জ্বর ছেড়ে গেল, কিন্তু নাড়ীর গতি কমতে শুরু করল। দুপুর একটা নাগাদ অবস্থা খারাপের দিকে গেল। তারপর, আচমকা বেলা পাঁচটার সময় মৃত্যু এসে তাঁর শিয়রে দাঁড়াল। নির্মম হাতে কেড়ে নিয়ে গেল ভারতের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তানকে।

দাদু একটু থামলেন। তারপর চোখ মুছে বললেন, একটা বিশেষ ট্রেন আজ কলকতার হাতে তুলে দিতে আসছে আমাদের পরম প্রিয় নেতাকে।

তারপর।

শোকে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে গাড়ীটা এসে

স্টেশনে ঢুকল। জনতা অধীর হয়ে উঠল এবার। আকুলি বিকুলি শুরু হল তাদের ভেতর। সবাই কাছে যেতে চায়। একবার নিজের চোখে দেখতে চায় দেশবন্ধুকে।

চিত্তরঞ্জনের পবিত্র দেহ আস্তে আস্তে ট্রেন থেকে নামিয়ে এনে শবাধারে তোলা হল। চোখের নিমেষে ফুলের মালায় ভরে গেল শবাধার।

তারপর শুরু হল শবযাত্রা। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে জনতার স্রোত চলল পিছনে পিছনে। পথের দুপাশে শুধু মানুষ আর মানুষ। তারা কাঁদছে, হাহাকার করছে।

নিজের বাড়িতে আনা হল দেশবন্ধুকে। দুই চোখ-ভরা জল নিয়ে পাশে এসে দাঁড়ালেন মহাত্মা গান্ধী।

সেখান থেকে শ্মশান। সাথে সাথে এলেন মহাত্মা গান্ধী। সাজানো চিতার উপর শুইয়ে দেওয়া হল দেশবন্ধুর দেহ। তারপর একসময় দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল সেই চিতা। মহাত্মা গান্ধী কান্না-ভেজা গলায় বলে উঠলেন, দেশবাসী, তোমরা দেশবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হও ॥